alfirdaws.org

বিজয়ের পদধ্বনি- ৫ || আল-কায়েদা কর্তৃক ৯/১১ হামলা ও চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধের সূচনা | AlFirdaws |

6 - 8 minutes

খিলাফতে উসমানীয়ার পতনের অর্ধশতাধিক বছর পর ৯০ এর দশকে প্রথমবারের মত তালিবান আন্দোলনের মাধ্যমে ইসলামী শরিয়াহ্ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য ব্যাপক আকারে জিহাদী কার্যক্রম শুরু হয় আফগানিস্তানে। এই জিহাদ আরব আজমের প্রতিটি মু'মিনের অন্তরকে নাড়া দিয়েছিল। উম্মাহ'র যুবকরা আবারো খিলাফাহ ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনতে এবং শাহাদাত লাভে ধন্য হতে আফগান জিহাদ ঘিরে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেন। এই স্বপ্ন নিয়ে আরব-আজমের মুসলিম যুবকরা জড়ো হতে থাকেন আফগানের ভূমিতে।

আফগানে হিজরত করা মুসলিমদের মধ্যে আরবদের মোটা দাগে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায় – একদল ইয়েমেনি এবং অপর দল মিশরীয়।

সরল ধর্মীয় অনুভূতি থেকে অনেক আরব ভাই ইয়েমেনিদের ক্যাম্পে যোগ দিতেন। সর্বদা কঠোর প্রশিক্ষণ এবং সালাত, যিকির-আযকারে মশগুল থাকায় তাদের প্রশংসা করে অনেকেই "দরবেশ" বলে ডাকতেন। আশির দশকের শেষ দিকে রুশরা পর্যুদস্ত হয়ে আফগানের ভূমি ত্যাগ করতে থাকলে এই "দরবেশ" ভাইদের অনেকেই নিজ দেশে ফিরে যান। তবে অনেকে রয়ে যান এবং বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে আফগানে বসবাস শুরু করেন।

অপরদিকে মিশরীয় ক্যাম্পে যারা ছিলেন, তাদের চিন্তাধারা ছিল দূরদর্শী এবং রাজনৈতিক। তাদের অনেকেই ছিলেন ইখওয়ানুল মুসলিমীন এর প্রাক্তন সদস্য। কিন্তু ইসলাম কায়েমের জন্য জিহাদকে বেছে না নেয়ায় তারা ইখওয়ানদের উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। এই ক্যাম্পের ভাইদের অনেকেই ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার এবং মিশরের সেনাবাহিনীর প্রাক্তন অফিসার। আরো ছিলেন মিশরের ডক্টর আইমান আয যাওয়াহিরির সংগঠন "জামাআতুল জিহাদ" এর সদস্যরা। তারা বাস্তবিক অভিজ্ঞতার আলোকে উপলব্ধি করেন, মুসলিম বিশ্বের সকল সর্বনাশের মূল হলো অ্যামেরিকা, আর মুসলিম নামধারী মধ্যপ্রাচ্যের আমেরিকার পদলেহী শাসকেরা। মিশরীয় ক্যাম্পের নেতৃত্ব ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন স্বয়ং ড. আইমান আয যাওয়াহিরি (হাফিযাহুল্লাহ)। তিনি প্রায়ই এশার সালাতের পর চলমান বৈশ্বিক সমস্যা নিয়ে সবার সাথে আলোচনা করতেন।

তালিবান মুজাহিদীনরা ১৯৯৬ এ ইসলামি ইমারত প্রতিষ্ঠা করার সময়ের মধ্যে মিশরীয় এই ক্যাম্পটি অনেক যুবকের নজর কাড়ে এবং তারা সবাই এই ক্যাম্পেই যোগ দেন। এখান থেকেই শায়েখ উসামা বিন লাদেন, শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম, শায়েখ আবু উবাইদাহ (রহিমাহুমুল্লাহ), ড. আইমান আয যাওয়াহিরি (হাফিযাহুল্লাহ) প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের হাতে আল-কায়েদার জন্ম হয়। আরবি "القاعدة" শব্দের অর্থ "ঘাঁটি", বা ভিত্তিস্থাপন। মূলত আরব মুজাহিদীনদের ঘাঁটি থেকে দলটির সূচনা ও নতুন এক ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তিস্থাপনের স্বপ্ন নিয়ে পাথ চলা শুরু করায় এর

নামকরণ করা হয় "আল-কায়েদা"।

এখন ফিরে যাওয়া যাক তালিবান শাসনামলে। বিজয়ের পদধ্বনি- ৪ পর্বের শেষ অংশের পর থেকে...

তালিবান ও আল-কায়েদার নেতৃত্ব বুঝতে পারলেন যে, তাদের ভবিষ্যত ইসলামি রাষ্ট্রের জন্য সবাচাইতে বড় হুমকি হচ্ছে অ্যামেরিকা ও তাদের অর্থায়নে পরিচালিত আফগানের উত্তরাঞ্চলের মিত্র জোট। অ্যামেরিকা যতদিন নিজ শক্তি ও সমর্থন নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে এবং যতদিন এর মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া না হবে, ততদিন ইসলামি শাসন ব্যাবস্থা স্থায়ী হবেনা। তাদের স্বপ্নও পূর্ণ হবে না। ফলে ইমামুল মুজাহিদিন শহিদ শাইখ ওসামা বিন লাদেন রহিমাহুল্লাহ্'র নির্দেশে প্রথমেই অ্যামেরিকা ও পশ্চিমাদের অর্থায়নে পরিচালিত উত্তরাঞ্চলীয় জোটের নেতা আহমদ শাহ মাসুদকে মুজাহিদগণ হত্যা করেন এবং তাদের ঐক্য ও শক্তি ধ্বংস করে দেন। আহমদ শাহ মাসুদের হত্যা ও তাদের পরাজয় ছিল স্পষ্টত আমেরিকার গালে চপেটাঘাত, সেই সাথে ইমারতে ইসলামিয়াকে ধ্বংস করতে পশ্চিমাদের প্রথম প্ল্যান ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু অ্যামেরিকা বসে থাকার মত কোন শক্তি নয়; বরং তারা ইমারতকে ধ্বংস করতে নতুন নতুন পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকে। অ্যামেরিকার লক্ষ ছিলো আফগানিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা এবং বিশ্ব রাজনীতিতে কোনঠাসা করে রাখা। বিভিন্ন ভাবে অ্যামেরিকা আফগানিস্তানে অস্থির অবস্থা তৈরি করতে থাকে। বিশেষ ভাবে, তৎকালীন যুদ্ধবাজ গোত্রীয় নেতাদের হাতে অস্ত্র এবং ডলার তুলে দিয়ে।

এসবের মধ্যমেই ইমারতে ইসলামিয়ার তালিবান সরকার ও তাদের পরীক্ষিত বন্ধু আল-কায়েদা বুঝতে পারে যে, অ্যামেরিকার সাথে তাদের একটি সংঘর্ষ নিকট প্রায়। আল-কায়েদা ও তালিবান এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রচলিত কৌশলে আমেরিকার সাথে সম্মুখ যুদ্ধে টিকে থাকা কঠিন হবে। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেন যে, অ্যামেরিকা একটি দীর্ঘ মেয়াদী গেরিলা যুদ্ধে আটকে ফেলা হবে। বিশেষ ভাবে, সোভিয়ের ইউনিয়নের সাথে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে আল কায়েদা এই রণকৌশল গ্রহন করে।

দীর্ঘদিন যাবৎ এই অ্যামেরিকা সারা দুনিয়ায় লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যা করেছে। কিন্তু অ্যামেরিকা এ সকল কিছু করেছে আড়ালে থেকে। এজন্য মুসলিম উম্মাহ'র সামনে অ্যামেরিকার আসল চেহারা পরিষ্কার ছিলোনা। এমনকি অনেকে তো এমনও মনে করতেন, অ্যামেরিকা বুঝি সত্যিই মানবদরদী, বিশ্ব মানবতার প্রতীক! এই প্রতারণা থেকে উম্মাহ'কে মুক্তি দেয়ার জন্য দরকার ছিলো অ্যামেরিকার আসল চেহারা প্রকাশ করে দেয়া। একই সাথে, আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার ছিলো তা হচ্ছে – অ্যামেরিকাকে সাপের মাথা হিসেবে চিহ্নিত করা। মুসলিম বিশ্বে অ্যামেরিকার মদদ পুষ্ট বিভিন্ন মুরতাদঃ সরকার সাধারণ মুসলিমদের উপরে নিপীড়ন চালিয়ে আসছিল। বিভিন্ন জিহাদি জামাত গুলো মনে করতেন, এরাই বুঝি উম্মাহ'র সবচেয়ে বড় শত্রু এবং তাদেরকেই আঘাত করতেন। কিন্তু অ্যামেরিকা বার বার তার স্বার্থ মত নতুন শাসক ক্ষমতায় নিয়ে আসতো, এতে করে উম্মাহ'র মেহনত থেকে তেমন কোন ফল প্রকাশ পাচ্ছিলোনা। এজন্যও এটি প্রকাশ করা জরুরী ছিল যে, আসল শত্রু এবুং সাপের মাথা আচ্ছে অ্যামেরিকা।

এই যুদ্ধের জন্য আল-কায়েদার প্রয়োজন ছিল সাপের মাথা আমেরিকাকে তার নিজ সুরক্ষিত গর্ত থেকে খোলা ময়দানে বের করে আনা। অ্যামেরিকাকে এমন আঘাত করা যেন সে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে এসে যুদ্ধের ফাঁদে পা দেয়। তবে এই আঘাত শুধু অ্যামেরিকা'কে যুদ্ধে টেনে নিয়ে আসার জন্য নয় বরং লক্ষ লক্ষ মুসলিম হত্যার প্রতিশোধও বটে।

এই প্রেক্ষাপটে, ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, অ্যামেরিকার বুকে তাদেরই ভূমি থেকে তাদের হৃদপিন্ডে ৪টি বিমান হামলা চালায় আল কায়েদা যা বিশ্ববাসীর কাছে ৯/১১ হামলা নামে অধিক পরিচিত।

আল-কায়েদা, বরকতময়ী এই হামলার মাধ্যমে তাদের দূরদর্শিতা ও রণকৌশলের সক্ষমতার জানান দেয়। তাঁরা প্রমাণ করে দেন যে, রণদক্ষতায় কতটা পারদর্শী। এই হামলার ফলে অ্যামেরিকার নীতিনির্ধারক ও কৌশলবিদরা তাদের চিন্তা শক্তি হারিয়ে ফেলে। অ্যামেরিকা তখন যুদ্ধের ফলাফল চিন্তা না করে এবং দীর্ঘমেয়াদী কৌশল গ্রহণ না করেই আফগানে হামলা করে বসে। প্রথম ধাক্কায় মুজাহিদগণ কৌশল হিসেবে পিছু সরে যান, অ্যামেরিকাকে ভাবার সুযোগ দেন তারা জয়ের স্বাদ পেয়েই গেছে। এরই মাঝে সন্ত্রাসী অ্যামেরিকা আফগান থেকে নজর দেয় ইরাকের দিকে।

এবার আল কায়েদা এবং তালিবান অ্যামেরিকাকে পাল্টা আক্রমন করে বসে বিপুল বিক্রমে। বিজয়ের ভ্রান্ত স্বাদ পাওয়া অ্যামেরিকার নেশার ঘোর কাটতে বেশী সময় লাগেনি, কিন্তু ততক্ষণে তার আর কিছুই করার নেই। শুধু তাই নয়, আফগানিস্তানের সাথে সাথে ইরাকেও চলতে থাকে অ্যামেরিকার উপরে পাল্টা আক্রমন। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে অ্যামেরিকা দিশেহারা, পাগলা কুকুরের মত হয়ে যায়! শুধু তাই নয় অ্যামেরিকাকে দুনিয়া জুড়ে বিভিন্ন ভাবে আঘাত করা হতে থাকে, অ্যামেরিকার নিরাপত্তা নষ্ট করে ফেলা হয়। অ্যামেরিকা বুঝতে পারে ঘরে কিংবা ময়দানে কোথাও সে নিরাপদ নয়। এমন ভীতিকর অবস্থায়, অহংকারে উন্মত্ত অ্যামেরিকা শুধু একটি কাজই করতে পারে তা হচ্ছে পরিত্রাণ পাবার আশায় বিলিওন বিলিওন ডলার খরচ করতেই থাকা ... গলায় যে কাঁটা বেঁধে গেছে!

চলবে ইনশা আল্লাহ...

লেখক: **ত্বহা আলী আদনান,** *প্রতিবেদক: আল ফিরদাউস নিউজ।*

পড়ুন আগের পর্বগুলো-

বিজয়ের পদধ্বনি-১

বিজয়ের পদধ্বনি- ২

বিজয়ের পদধ্বনি- ৩

বিজয়ের পদধ্বনি- ৪-১

বিজয়ের পদধ্বনি- ৪-২

বিজয়ের পদধ্বনি- ৪-৩